Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনুবা আক্তার মিতু

রোলঃ 227020675

২০ মে, ২০২৫ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনুবা আক্তার মিতু

রোলঃ 227020675

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সীরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনুবা আক্তার মিতু , আইডিঃ 227020675 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সীরাহ" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তাসনুবা আক্তার মিতু

আইডিঃ 227020675

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সূচনা 1

নাম ও উপাধি 1

বংশধারা 2

জন্মতারিখ 2

জন্ম ও শৈশবঃ 3

নামকরণঃ 3

আহমদ নামকরণঃ 3

দুগ্ধ পান কালঃ 4

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানেঃ 4

খাদীজা (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহঃ 5

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) 5

ওহী নাযিলের সূচনাঃ 5

মি'রাজ তথা উর্দ্ধারোহনঃ 6

দাওয়াতের আদেশঃ 7

গোপনে ইসলামের দাওয়াতঃ 7

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতঃ 7

ধৈর্য ও অবিচলঃ 8

আল-আমীন উপাধি লাভঃ 8

তায়েফ গমনঃ 8

মদিনায় হিজরতঃ 9

মদীনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনাঃ 9

সশস্ত্র সংঘাতের সূচনা: বদর যুদ্ধ 9

উহুদের যুদ্ধ: 11

মক্কা বিজয়ঃ 12

বিদায় হজ্জঃ 13

জীবনসায়াহ্নে নবীজি (সা) ও তার ইন্তিকালঃ 14

তথ্যসূত্র 15

সূচনা

আরবি ভাষায় " সীরাত" (আরবি : سيرة) শব্দটি "সারা" ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে, যার অর্থ "ভ্রমণ করা" বা "ভ্রমণে থাকা"। একজন ব্যক্তির "সীরাত" হল সেই ব্যক্তির জীবনের মধ্য দিয়ে যাত্রা, বা জীবনী, যার মধ্যে তাদের জন্ম, তাদের জীবনের ঘটনাবলী, আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মৃত্যু অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ব্যবহারে এটি একজন ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তকেও বোঝাতে পারে।
ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনিভিত্তিক আলোচনা বা লেখনীকেই সিরাত বলে।

নাম ও উপাধি

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পুরো নাম আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দ মানাফ আল কুরাইশি (আরবি: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي)। সংক্ষেপে তাকে "আবুল কাসিম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল হাশিমি" বলেও ডাকা হয়। এই নামের বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: "কুরাইশ গোত্রের আব্দুল মানাফের পুত্র হাশিম, হাশিমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিব, আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ"।[২৫] এছাড়াও সমাজে তিনি আল-আমিন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।
মুহাম্মাদ নামের বাংলা অর্থ "প্রশংসনীয়" এবং এই নামটি কুরআনে মোট চারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২] কুরআনে মুহাম্মাদকে বিভিন্ন উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে। এসব উপাধির মধ্যে রয়েছে: আহমাদ, [কুরআন ৬১:০৬] নবি, রাসুল, আল্লাহর বান্দা (আবদ), সুসংবাদদাতা (বশির),[কুরআন ২:১১৯] সাক্ষী (শাহিদ),[কুরআন ৩৩:৪৫] মঙ্গলবার্তা প্রদানকারী (মুবাশশির), সতর্ককারী (নাজির),[কুরআন ১১:২] উপদেশদাতা (মুজাক্কির),[কুরআন ৮৮:২১] আহ্বানকারী

(দাঈ),[কুরআন ১২:১০৮] আলোকিত ব্যক্তি (নূর),[কুরআন ৫:১৫] এবং আলো-প্রদায়ক প্রদীপ (সিরাজ মুনির)।[কুরআন ৩৩:৪৬]

বংশধারা

কিছু হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই তার বংশধারাকে ইব্রাহিম নবির সাথে সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ ইব্রাহিমের সন্তানাদির মধ্য থেকে ইসমাইলকে, ইসমাইলের সন্তানাদির মধ্যে থেকে কিনানাহকে মনোনীত করেন। কিনানাহর বংশধারার মধ্য থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।"

— সহিহ মুসলিম, তিরমিজি

জন্মতারিখ

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, ইসলামের ইতিহাসে "ফিলবর্ষ" বা "হস্তিবর্ষ" নামে পরিচিত সময়ে মুহাম্মাদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[৯৯] ঐতিহ্য অনুযায়ী, এই বছরেই আবিসিনিয়ার আকসুম রাজ্যের অধীনস্থ ইয়েমেনের শাসক আবরাহা কাবাঘর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে অভিযান চালান, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।[১০০][১০১] হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সঠিক জন্মতারিখ নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায় না। প্রাচীন হিসাবের ভিত্তিতে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানি ইসলামি পণ্ডিত মোহাম্মদ হামিদুল্লাহের মতে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৭ জুন ৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে।[৯৯] আবার কিছু উৎসে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।[১০২][১০৩] মিশরীয় জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা আল-ফালাকী তার গবেষণায় জন্মতারিখ ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

জন্ম ও শৈশবঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্তমান সৌদি আরবে অবস্থিত মক্কা নগরীর কুরাইশ গোত্রের বনি হাশিম বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। তার মায়ের নাম আমিনা এবং পিতার নাম আব্দুল্লাহ। অতি অল্প বয়স থেকেই আল্লাহ তাকে কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেন। জন্মের পূর্বে পিতা, ৬ বছর বয়সে মা আমিনাকে হারান। এবং ৮ বছর বয়সে তার দাদা মৃত্যু বরণ করেন। ইয়াতীম শিশু বড় হয়ে উঠে চাচার সযত্ন ভালবাসায়।

নামকরণঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাল্লাম এর জন্ম হওয়ার পরই মা আমেনা এ সংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে পাঠান। সংবাদ পাওয়ার পরেই তিনি ছুটে আসেন। পরম স্নেহে দেখেন, যত্নের সঙ্গেঁ কোলে নিয়ে কা’বার ভেতর প্রবেশ করেন, আল্লাহর হামদ বর্ণনা করেন এবং দোয়া করেন। অতঃপর তাঁর নাম রাখেন ‘মুহাম্মদ’(প্রশংসিত)।

আহমদ নামকরণঃ

বিবি আমিনা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত নাম অনুসারে ‘আহমদ’ (উচ্চ প্রশংসিত’) নাম রাখেন। বাল্যকাল হতে মুহাম্মদ ও আহমদ উভয় নামি প্রচলিত ছিল। উভয় নামই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

দুগ্ধ পান কালঃ

সর্ব প্রথম তাঁকে তাঁর মাতা হযরত আমেনা দুগ্ধ পান করান। অতঃপর আবু লাহাবের বাঁদী ‘সুওয়াইবা’ তাকে দুগ্ধ পান করায়। অতঃপর ধাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন। ‘হাওয়াযিন’ গোত্রের বানী সা’দ এর মহিলা হালীমা ছা’দিয়া এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এমন ভাবে যে, অন্য কোন ধাত্রী শিশু মুহাম্মদকে গ্রহণ করলনা পক্ষান্তরে হালীমা সাদীয়াও অন্য কোন শিশু পেলনা। ফলে বাধ্য হয়ে রসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম কে গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করার পর থেকেই হালীমার ঘরে ইলাহী বরকতের জোয়ার শুরু হল। দুবছর দুগ্ধ পানের পর বিবি হালীমা শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে তাঁর মায়ের নিকট হাজির হন এবং সাথে সাথে এই আকাঙ্খাও ব্যক্ত করেন যে, শিশুকে আরো কিছু দিনের জন্য তাঁর নিকট যেন থাকতে দেয়া হয়। এদিকে মক্কায় তখন মহামারী চলছিল। উভয় দিক চিন্তা করে বিবি আমেনা তাঁর শিশুকে হালীমার নিকট ফিরিয়ে দেন। এমনি ভাবে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বানী সাদে লালিত পালিত হন। সেখানে তিনি তাঁর দুধ ভাইদের সঙ্গে জঙ্গঁলে ছাগল চরাতেন। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, সীরাতুননবীঃ ১/১৭২)

দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধানেঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর মাতা-পিতার মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের দায়িত্ব নেন। তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। এমনকি নিজের ছেলেদের উপরও তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। নিজের আসনে বসাতেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন।দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁর দায়িত্ব নেন। তখন তার বয়স ছিল আট বছর। তিনি চাচা আবু তালিবকে বকরী লালন-পালন ও শাম দেশের ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করতেন।

খাদীজা (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহঃ

পঁচিশ বছর বয়সে মক্কার ধনবতী মহিলা খাদিজা বিনতে খোয়ালিদের সাথে রাসূল (সাঃ) এর বিয়ে হয়। অভিজাত সতী, ধনবতী, মহিলা খাদিজা বিভিন্ন লোককে পণ্য দিয়ে ব্যবসা করাতেন এবং তিনি লাভের একটা অংশ গ্রহণ করতেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সততা, সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্ততা তখন সুবিদিত ছিল। আল-আমীন, আসসাকিন এর প্রশংসা শুনে তিনি তার কাছে ব্যবসার প্রস্তাব পাঠান। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) রাজী হন এবং ব্যবসা শেষে অনেক বেশি লাভসহ তার সব কিছু বুঝিয়ে দেন।

রাসূলের গুণ মুগ্ধ ও অলৌকিক সংকেতের কথা শুনে মা খাদিজা বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় এবং উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। তখন খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন রাসূল (সা:) আর কোনো বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করেননি। এরপর আদর্শিক প্রয়োজনে এবং নারী সমাজের বিভিন্ন উপকারের জন্য তিনি মোট ১১টি বিয়ে করেন। দু'জন তার মৃত্যুর পূর্বে মারা যান আর ৯ জনের সাথে তিনি বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ)

মহা গ্রন্থ আল কোরআন, ইতিহাস এর যুক্তি-প্রমাণ এবং বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী রমজান মাসের শেষ পর্যায়ে মহানবী (সাঃ) এর কাছে আল্লাহর দূত জিবরাইল (আ:) কে দিয়ে ওহী (আল্লাহর বাণী) প্রেরন করেন। এ সময় তার বয়স ৪০ পূর্ণ হয়। প্রথমে তিনি স্বপ্নে সে নিদর্শন পান এবং পরে সরাসরি পেয়েছিলেন।

ওহী নাযিলের সূচনাঃ

বেশীর ভাগ সময় তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ পাহাড় ‘জাবালে নূরে’ অবস্থিত ‘গারে হেরা’ তথা হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং ক্রমান্বয়ে কয়েক রাত সেখানে অতিবাহিত করতেন। থাকার ব্যবস্থাও তিনি আগে থেকেই করে নিতেন। এভাবে একদা তিনি হেরা গুহায় তাশরীফ আনেন এমন সময় তাঁকে নুবুওয়াতের পদমর্যাদা দিয়ে সৌভাগ্যবান করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১ তম বছরে ২৭ ই রজব (হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে) মুতাবিক ৬১০ খৃষ্টাব্দ তারিখে জাগ্রত ও চৈতন্য অবস্থায় এঘটনা সংঘটিত হয়। আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) প্রথমবারের মত তাঁর কাছে, পৃথিবীবাসীদের জন্য আল্লাহর সর্বশেষ ঐষীবাণী, বিশ্বমানবতার মুক্তির পথের দিশারী, জ্বিন ও ইনসানের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান ‘আল্ কুরআনুল কারীম’ এর সর্বপ্রথম কথাগুলো নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

“পড় তোমার প্রতিপালকের নামে

তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমন করেন এবং বলেনঃ পড়ুন। তিনি উত্তর দিলেন আমি কি ভাবে পড়ব? ফেরেশতা বললেনঃ

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না”। (সূরা আলাকঃ ১-৫।)

মি‘রাজ তথা উর্দ্ধারোহনঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর বয়স যখন ৫১ বছর নয় মাস হয়, তখন তাঁকে সশরীরে মর্যাদাপূর্ণ ইসরা ও মি’রাজ ভ্রমণের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। মি’রাজে রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে কা’বা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে যান, অতঃপর সেখান থেকে এক এক করে সাত আসমান অতিক্রম করে মহান আল্লাহর আরশে আজীমে তাশরীফ গ্রহণ করেন। এ মি’রাজ সফরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) পাঁচ ওয়াক্ত

নামাযে বিধান লাভ করেন। মি’রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাত এবং জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

দাওয়াতের আদেশঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলামের দাওয়াতের আদেশ দিয়ে ইরশাদ করেন “হে চাদরাবৃত ব্যক্তি! ওঠ এবং সতর্ক কর।”

গোপনে ইসলামের দাওয়াতঃ

রাসলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ যথাযথ পালন করেন এবং গোপনে মানুষের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি সর্বপ্রথম আপন পরিবার- পরিজন ও বন্ধু-বর্গকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সর্বপ্রথম খাদীজা রা. তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক (রা), ছোটদের মধ্যে আলী ইবনে আবূ তালিব রা. এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারেসা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বছর পর্যন্ত গোপনে তার নিকটস্থ’ লোকদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন।

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতঃ

তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর মুহাম্মাদ প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। নবী (সাঃ) সাফা পর্বতের ওপর দাড়িয়ে চিৎকার করে সকলকে সমবেত করেন। এরপর প্রকাশ্যে বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। এই সময় থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

ধৈর্য ও অবিচলঃ

মুসলমানগণ মুশরিকদের সকল নির্যাতন ও নিপীড়ন ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করতেন। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাওয়াব ও জান্নাত লাভের আশায় বিপদে ধৈর্য ধারণ ও অনড় থাকার পরামর্শ দেন। মুশরিকদের নির্যাতন ভোগ করেছেন এমন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাহাবী হলেন: বিলাল ইবনে রাবাহ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. প্রমুখ। মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন ইয়াসির ও সুমাইয়া রা. এবং ইসলামের ইতিহাসে তারাই সর্বপ্রথম শহীদ।

আল-আমীন উপাধি লাভঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বাল্যকাল হতেই চিন্তামগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন দুর্দশাগ্রস্থ ও নিপিড়ীত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। আরববাসী তার নম্রতা, বিনয়, সত্যবাদিতা ও সৎস্বভাবের জন্য তাঁকে ‘আল-আমীন’ বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

তায়েফ গমনঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আশ্রয়দাতা চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুকে কুরাইশরা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। তার উপর নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দিল। এ কঠিন পরিস্থিতে সহযোগিতা ও আশ্রয় পাওয়ার আশায় তিনি তায়েফ গমন করলেন। কিন্ত সেখানে উপহাস ও দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাথর নিক্ষেপ করে আহত করে। ফলে তিনি আবার মক্কায় ফিরে যান।

মদিনায় হিজরতঃ

কুরাইশরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাযত করেন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্বীয় ঘর থেকে বের হন এবং আল্লাহ তাআলা কাফেরদের চক্ষু অন্ধ করে দেন যাতে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে না পারে। তিনি চলতে চলতে মক্কার বাইরে আবু বকর সিদ্দীক রা. এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর তারা এক সাথেই পথ চলা আরম্ভ করেন। সওর নামক পাহাড়ে পৌঁছে একটি গুহায় তিন দিন পর্যন্ত আত্মগোপন করেন। এ সময়টিতে আব্দুল্লাহ বিন আবূ বকর রা. তাদের নিকট কুরাইশদের সংবাদ পৌঁছাতেন এবং তার বোন আসমা খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে দিতেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গী আবু বকর (রা) গুহা হতে বের হন এবং মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেন।

মদীনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনাঃ

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মদীনায় পৌঁছে তাকওয়ার ভিত্তিতে ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে মদীনা শরীফে এ মসজিদটি "মসজিদে কু'বা" নামে পরিচিত। মদীনাতে রাসুল (স) সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো মসজিদে নববী নির্মাণ এবং আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

সশস্ত্র সংঘাতের সূচনা: বদর যুদ্ধ

মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাত এবং তাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করত। মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলাকে লুণ্ঠন করারও চেষ্টা করেছিল কুরাইশরা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন মদিনায় হিজরত করেন, তখন মক্কার কাফেররা মদিনায় অভিবাসী মুসলমানদের

সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। যুদ্ধের অনুমতি দেয় এমন আয়াত নাজিল হওয়ার পর, এই লুণ্ঠনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সমাধান করার জন্য মুসলমানরা মক্কার কাফেলা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খবর পেলেন যে, মক্কার একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন এই বিশাল কাফেলা সম্পর্কে শুনলেন, তিনি তার সাহাবীদের একত্রিত করেন। এজন্য তিনি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য সাহাবীদের প্রস্তুতি নিতে বলেন। ফলস্বরূপ, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মার্চ, প্রায় ৩১৩ জনের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। সিরিয়া থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান খবর পান যে মুসলিমরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কুরাইশ গোত্রের প্রায় ১০০০ জন মক্কা থেকে আবু জেহেলের নেতৃত্বে রওনা হয়। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানরা কঠিন প্রতিরোধ করে। কুরাইশদের সেনাপতি আবু জাহেল যখন নিহত হন, তখন তারা পালিয়ে যেতে শুরু করে। কয়েক ঘন্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। কুরআনের কিছু আয়াত এবং পরবর্তীকালের কিছু বর্ণনা অনুসারে, যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধ ছিল মুসলিমদের মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রথম জয়। যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন এবং কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ১০০০ জনেরও বেশি। যুদ্ধে মুসলমানরা ৭০ জন পৌত্তলিককে হত্যা করে এবং ৭০ জনকে বন্দি করে। মুসলমানদের মাত্র ১৪ জন শহীদ হন। যুদ্ধের পর মুহাম্মাদ বন্দিদের সাথে উদার আচরণ করার নির্দেশ দেন। বন্দীদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের প্রতিশোধ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্যান্য বন্দীদের তাদের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে অর্থ প্রদানের শর্ত আরোপ করা হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে পারত তাদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে পারত না তাদের ১০ জন করে মুসলমানকে পড়া-লেখা শেখানোর শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। বদর যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল। এটি তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং ইসলামের প্রসারের পথ সুগম করে। এই যুদ্ধের পর

মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরও তীব্রভাবে শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে।

উহুদের যুদ্ধ:

মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধে মুসলিমদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। এই পরাজয়ের ক্ষোভ তাদের মনে গেঁথে ছিল। কারণ, এই যুদ্ধের পর শামের বাণিজ্যপথ মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং মুসলিমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মক্কার কাফেররা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে দ্বিতীয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২০০ জন অশ্বারোহী, ৭০০ জন বর্মধারী সহ মোট ৩,০০০ জনের একটি সৈন্য তৈরি করা হয় এবং যাত্রা শুরু করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি মক্কার যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখে মদিনায় পাঠান। চিঠি পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যুদ্ধ কীভাবে পরিচালনা করা হবে তা নিয়ে সাহাবীদের সাথে আলোচনা শুরু করেন এবং এরপর মক্কা বাহিনীর মোকাবিলায় সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করা হয়।

মক্কার সৈন্যবাহিনী, ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ মক্কা থেকে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করে। এই আক্রমণে মক্কাবাসীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গত বছর সংঘটিত বদর যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ নেওয়া এবং মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে দমন করা। মুসলিমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। কিছুক্ষণ পর দুই বাহিনী উহুদ পর্বতের পাদদেশে ও সমতলে মুখোমুখি হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উহুদ পর্বতের একটি সংকীর্ণ গিরিখাতের দুই পাশে তার তীরন্দাজদের মোতায়েন করেন। এই কৌশলের মাধ্যমে তিনি মক্কা বাহিনীর উহুদ পর্বতের চারপাশে ঘুরে মুসলিমদের উপর সম্ভাব্য আক্রমণের সম্ভাবনা রোধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি তার তীরন্দাজদের নির্দেশ দেন, "নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের অবস্থান ত্যাগ করবে না!" মুসলিমদের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ জন।

উহুদ পর্বতের পাদদেশে দুই পক্ষের বাহিনী মুখোমুখি হয়। যুদ্ধের শুরুতে মুসলিমদের জোরালো আক্রমণের মুখে মক্কার বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে, মুসলিম বাহিনীর ধনুর্ধররা ভেবে নেয় যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং তারা তাদের অবস্থান ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যাওয়া মক্কার বাহিনীর সম্পদ সংগ্রহ করতে শুরু করে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খালিদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে ধনুর্ধরদের ফাঁকা অবস্থান দিয়ে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে মুসলিম বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পিছু হটতে শুরু করে। পিছু হটতে থাকা মক্কার বাহিনী এই সুযোগে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। মুসলিম বাহিনী উহুদ পর্বতের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হয়। পর্বতে আশ্রয় নেওয়া মুসলিম বাহিনী তীরন্দাজদের সাহায্যে মক্কার বাহিনীকে পিছু হটাতে সক্ষম হয়। মক্কার বাহিনীও নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ৭০ জন সৈনিক শহীদ হয় এবং মক্কার বাহিনীর ৪৪-৪৫ জন সৈনিক নিহত হয়। এই যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) গুরুতর আহত হন এবং তার চাচা হামযা সহ আরও অনেক মুসলিম নিহত হন। মক্কার বাহিনীর নেতা আবু সুফিয়ান এই যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবে ঘোষণা করে।

মক্কা বিজয়ঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন গোত্রে তাঁর দাওয়াতী কর্মসূচী অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে এক বছরের মাথায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই মাঝে কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ বনু বকর মুসলমানদের মিত্র কবীলায়ে খুযা'আর উপর আক্রমণ করল। এর অর্থ দাঁড়াল কুরাইশ এবং তার মিত্ররা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করল।নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পেয়ে অত্যধিক

ক্রুদ্ধ হন এবং মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে দশ হাজার যোদ্ধার একটি বিশাল সেনাদল গঠন করেন।

তখন ছিল হিজরী অষ্টম বর্ষের রমযান মাস। এদিকে কুরাইশরা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কাভিমুখে অভিযানের সংবাদ পেয়ে তাদের নেতা ও মুখপাত্র আবূ সুফিয়ানকে ক্ষমা প্রার্থনা, সন্ধি চুক্তি বলবৎ এবং চুক্তির মেয়াদ আরো বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমার আবেদন নাকচ করে দিলেন। কারণ তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ ব্যতিত আর কোন উপায় না দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সেনাদল (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে মক্কার কাছাকাছি আসলে মক্কাবাসী বিশাল দল দেখে আত্মসমর্পণ করে। আর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং নিজ হাতের লাঠি দ্বারা কা'বার আশেপাশে রাখা সকল প্রতিমা ভেঙে চুরমার করে দেন। আর স্বীয় রবের শেখানো আয়াত পাঠ করতে থাকেন, "বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা ইসরা : ৮১) অতঃপর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ঘোষণা করেন মক্কা পবিত্র ও নিরাপদ।

বিদায় হজ্জঃ

দশম হিজরী সনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে হজব্রত পালন ও হজের আহকাম শিক্ষা গ্রহণ করতে মক্কায় যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান।قول الله تعالى :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورة المائدة : ৩)তাঁর আহ্বানে এক লক্ষের মত লোক সাড়া দিল। তাঁরা যুলকা'দাহ্ মাসের পঁচিশ তারিখ তাঁর সাথে মক্কা পানে বের

হন। বাইতুল্লায় পৌঁছে প্রথমে তওয়াফ করেন। অতঃপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এরপর নয় তারিখ জাবালে আরাফাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করেন এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তার ঐতিহাসিক অমর ভাষণ দান করে তাদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান ও হজের আহকাম শিক্ষা দেন এবং আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করেন- “আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর হিজরী ১১ সালের সফর মাসে মুহাম্মদ (স) জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের তাপমাত্রা প্রচন্ড হওয়ার কারণে পাগড়ির ওপর থেকেও উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছিল। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এগারো দিন নামাজের ইমামতি করেন। অসুস্থতা তীব্র হওয়ার পর তিনি সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আয়েশা (রাঃ)এর কামরায় অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর কাছে সাত কিংবা আট দিনার ছিল,মৃত্যুর একদিন পূর্বে তিনি এগুলোও দান করে দেন। অবশেষে ১১ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে চলে যান। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

সর্বোপরি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্টায় এক অনন্য নজির স্থাপন করেন, সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সফল ব্যক্তিত্ব।

জীবনসায়াহ্নে নবীজি (সা) ও তার ইন্তিকালঃ

যখন আল্লাহর দ্বীন ও ইসলামের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করল এবং আরবের সমগ্র নিয়ন্ত্রন মুসলিমদের আওতায় এসে গেল তখন রাসূলের আরোগ্য-অনুরক্তি, প্রবণতা-প্রতিক্রিয়া, কথাবার্তা ও আচার আচরণ একেই স্পষ্ট হতে লাগলো যে, অস্থায়ী দুনিয়ার অধিবাসীদের বিদায়-সন্ধান জানানোর প্রস্তুতি রাসূল সাঃ নিতে শুরু করেছেন। তিনি আল্লাহর সামনিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

হিজরতের ১১তম বছর, সফর মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, এবং তিনি আয়েশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি উম্মতের প্রতি বিশেষ মমতা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, সালাতে গুরুত্বারোপ করেন, বিদায় হজ্জে উক্ত "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম..." আয়াতের মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা করেন।
রবিবার, ১২ রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরি, মহানবী (সা.) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকাল ছিল মানবজাতির জন্য এক গভীর শোকাবহ মুহূর্ত। তাঁকে আয়েশা (রা.)-এর ঘরে দাফন করা হয়, যা বর্তমানে রওজা মুবারক নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র

- *আর-রাহীকুল মাখতূম*, শাইখ সাফিউর রহমান মুবারকপুরী
- উইকিপিডিয়া: https://bn.wikipedia.org